রাজনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয়

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ মানবাধিকার সংরক্ষণ করা। যে সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সে সমাজ এই দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অর্পণ করে। মানবাধিকার বাদে জ্ঞানচর্চা হয় না। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিক্রমণ করার জন্য অধিকার দরকার। এই অধিকারের কাছে কোনকিছুই নিষিদ্ধ নয়। এই কনসেপ্টের ভিত্তিতে পশ্চিমে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয় এবং লিবারেলিজমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্ক ও কনসেপ্টের দু'টি দিক। একটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় সীমানার মধ্যে জ্ঞানের কোন চর্চাই নিষিদ্ধ নয়, অন্যটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক সীমানা অনবরত সমাজের মধ্যে প্রসারিত করা। প্রথমটা থেকে তৈরি হয় সাহসের বোধ, সবকিছুকে প্রশ্ন করার বোধ সাহসের বোধ, প্রশ্ন করার বোধ 'পবিত্র' অধিকার, এই অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা যায় না এবং উচিতও নয়। দ্বিতীয়টা থেকে তৈরি হয় রাষ্ট্র কিংবা সমাজ 'পবিত্র' নয় : এই বোধ। এই বোধ থেকে তৈরি হয় সহিষ্ণুতার বোধ এবং পরিবর্তনের বোধ। রাষ্ট্র কিংবা সমাজ 'পবিত্র' না হওয়ার দরুন রাষ্ট্র কিংবা সমাজ জ্ঞান থেকে উত্থিত সবল সাহস ও জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে সহিষ্ণু, একই সঙ্গে জ্ঞান থেকে উত্থিত বিদ্রোহ সমাজ জিজ্ঞাসার জন্য জরুরী বলে স্বীকৃত।

আমাদের দেশে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কনসেপ্ট আমরা পশ্চিম থেকে ধার করেছি। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে মানবাধিকার যেমন স্বীকৃত নয়, তেমনি অসহিষ্ণু রাষ্ট্রব্যবস্থা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিক্রমণ অধিকার হিসাবে মানতে রাজি নয়। তার দরুন রাষ্ট্রব্যবস্থা সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্দেহের চোখে দেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃদ্ধি হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্রে নানা ধরনের হস্তক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দেশে মানবাধিকারের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। অন্ধকারের মধ্যেও বাতিটিকে দেখা যায়। সকল নৈরাশ্যের মধ্যেও, সকল অনাচারের মধ্যেও বাতিটির দিকে চোখ মেলে রাখে সারা দেশ। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জিৎ। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে হার মানায়। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে। এই ঐতিহ্য সম্পদ, এই ঐতিহ্য মূল্যবান।

রাষ্ট্রব্যবস্থা, জিয়াউর রহমান থেকে, উন্নয়নের রাজনীতির নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে কদর্য করেছে। উন্নয়ন অর্থাৎ টেন্ডারবাজি, টেন্ডারবাজি অর্থাৎ অস্ত্র প্রতিযোগিতা। এই টেন্ডারবাজির মাধ্যমে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ছাত্রসমাজের সামান্য এক অংশকে ব্যবহার করেছে রাষ্ট্রব্যবস্থা। তৈরি হয়েছে সশস্ত্র ক্যাডার, যারা নামত ছাত্র, যারা মূলত মাস্তান, যাদের সঙ্গে পড়াশোনার সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রব্যবস্থা এই অছাত্র সশস্ত্র ক্যাডারদের পরিপুষ্ট করেছে, আশ্রয় দিয়েছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের দেশে লিবারেল হয়নি। রাষ্ট্রব্যবস্থা, সংসদীয় কিংবা প্রেসিডেন্সিয়াল যাই হোক, গণতান্ত্রিক হয়নি বলে ক্ষমতাকে লক্ষ্য করেছে, ক্ষমতাকে ধ্যান করেছে, ক্ষমতাকে আরাধনা করেছে। তার দরুন, রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে, রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে। ক্ষমতার দুর্বৃত্তায়নের জন্য রাজনীতি অর্থাৎ ছাত্ররাজনীতি শিক্ষকরাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা উঠেছে। ক্ষমতার দুর্বৃত্তায়ন উত্থিত রাজনীতির স্বার্থে প্রতিরোধের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা দরকার। সমাজের মধ্যে প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রতিরোধের মধ্যে আদর্শবোধ আছে, ভবিষ্যত দেখা ও গড়ার স্বপ্ন ও সাহস আছে। মাস্তান, ক্যাডার, অস্ত্রবাজ এই অংশটিকে ছাত্রসমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়েছে রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই অংশটির নির্দিষ্ট, নির্ধারিত কাজ হচ্ছে বিশাল সংখ্যক ছাত্রদের আদর্শবোধ, স্বপ্ন দেখার সাহস, ভবিষ্যত দেখার সঙ্কল্প নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্রে আছে লুণ্ঠনের বোধ, লুণ্ঠনকে স্থায়ী করার জন্য দরকার পেটানোর দর্শন। পিটিয়ে দাও, পিটিয়ে দাও, পিটিয়ে লাশ করে দাও, কেউ যেন কথা বলতে না পারে, মাথা তুলতে না পারে। অছাত্র, বদমাস, ছাত্র নামধারী ক্যাডার : এরা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রাণেশ্বর। লুসীরা হচ্ছে প্রাণেশ্বরী।

ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে কথা বলেছেন জিয়াউর রহমান, এরশাদ, জাস্টিস সাহাবুদ্দীন ও খালেদা জিয়া। এঁরা কেউই বড় মাপের মানুষ নন। এঁরা ক্ষমতার দিক থেকে রাজনীতি অর্থাৎ ছাত্ররাজনীতি বুঝতে চেয়েছেন। ক্ষমতার রাজনীতির যারা প্রতিবন্ধক তাদের নিষ্ক্রিয় করতে চেয়েছেন। এঁরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় বলতে একটা বড় আকারের পাঠশালা ভেবেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মানে এঁদের কাছে নেহাৎই পড়াশোনার জায়গা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ একটা স্বতন্ত্র বোধ, একটা ভিন্ন যুক্তি বিন্যাস, একটা অসম্ভব দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ক্ষমতার উদ্দেশে সত্য বলার সাহস ও স্বপ্নশীল বোধ। এই সাহস ও বোধকে ভয় পায় ক্ষমতার রক্ষকরা। সে জন্য তাঁরা ডি-পলিটিসাইজড মানুষ বানানোর লক্ষ্যে রাজনীতি অর্থাৎ ছাত্র ও শিক্ষকদের সাহস ও বোধ নিষিদ্ধ করতে চান। কিন্তু মানুষ কি খাঁচায় পোরা বাঘ? ব্যান্ড মাস্টারের চাবুকের নির্দেশে উঠবে এবং বসবে? যারা বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে, বিভিন্ন চিন্তা ও মতবাদের সান্নিধ্যে আসে, যারা বিকল্প অনুসন্ধান করে তারা, ছাত্ররা, সব সময়ই স্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে সত্য বলার সাহস রাখে। এই সাহসকে অবরুদ্ধ করার জন্যই ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা তোলা হয়। কিন্তু মানুষের বুকের মধ্যকার সাহসকে কি অবরুদ্ধ করা যায়? মানুষকে কি চূড়ান্ত অর্থে ডি-পলিটিসাইজড করা যায়? রাষ্ট্রপরিচালকদের নির্দেশনায় যখন শামসুন্নাহার হলে বীভৎস নারকীয় ঘটনা ঘটানো হয় তখন সাধারণ ছাত্ররা সত্য বলার সাহসে রাস্তায় বেরিয়ে আসে :

রাস্তা লোকে লোকারণ্য
পরোয়া আজ ভাবে
যে দেবে প্রাণ, জীবন দেবে
বরমাল্য তাকে।

বর্তমান মুহূর্তের রাষ্ট্রপরিচালকরা রাষ্ট্রপরিচালনার একটা বস্তাপচা দর্শন খুঁজে বার করেছে : নির্যাতন করো। সে জন্য তারা আলমগীরদের নির্যাতন করার মধ্যে দিয়ে সারা দেশকে নির্যাতন করেছে, জামাল ও সনিদের নিহত করার মধ্যে দিয়ে সারা দেশকে নিহত করেছে, আযমদের মসজিদে খুন করার মধ্যে দিয়ে সারা দেশকে খুন করেছে, পুলিশের চেহারা নিয়ে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সারা দেশকে বিবস্ত্র করেছে। উদ্দেশ্য একটাই ঃ মানুষকে ডি-পলিটিসাইজড করা। নির্যাতন করে, হত্যা করে, খুন করে, বিবস্ত্র করে কি মানুষকে ডি-পলিটিসাইজড করা যায়? করা সম্ভব? মানুষের স্বভাব বিদ্রোহ করা। মানুষ বিদ্রোহ করবেই। আর বিদ্রোহ করা রাজনীতির অন্তঃসার। রাজনীতি নিষিদ্ধ করা যায় না। জনৈক প্রতিমন্ত্রীর হুঙ্কার সত্ত্বেও, পুলিশ-বিডিআরের লাঠিবাজি-টিয়ারবাজি সত্ত্বেও, মাস্তানদের অস্ত্রের ঝনঝনানি সত্ত্বেও বিদ্রোহের রাজনীতি ঘিরে ধরেছে সরকারকে।

বর্তমান মুহূর্তের রাষ্ট্রপরিচালকরা রাষ্ট্রপরিচালনার একটা বস্তাপচা দর্শন খুঁজে বার করেছে : নির্যাতন করো। সে জন্য তারা আলমগীরদের নির্যাতন করার মধ্যে দিয়ে সারা দেশকে নির্যাতন করেছে, জামাল ও সনিদের নিহত করার মধ্যে দিয়ে সারা দেশকে নিহত করেছে, আযমদের মসজিদে খুন করার মধ্যে দিয়ে সারা দেশকে খুন করেছে, পুলিশের চেহারা নিয়ে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সারা দেশকে বিবস্ত্র করেছে। উদ্দেশ্য একটাই ঃ মানুষকে ডি-পলিটিসাইজড করা।